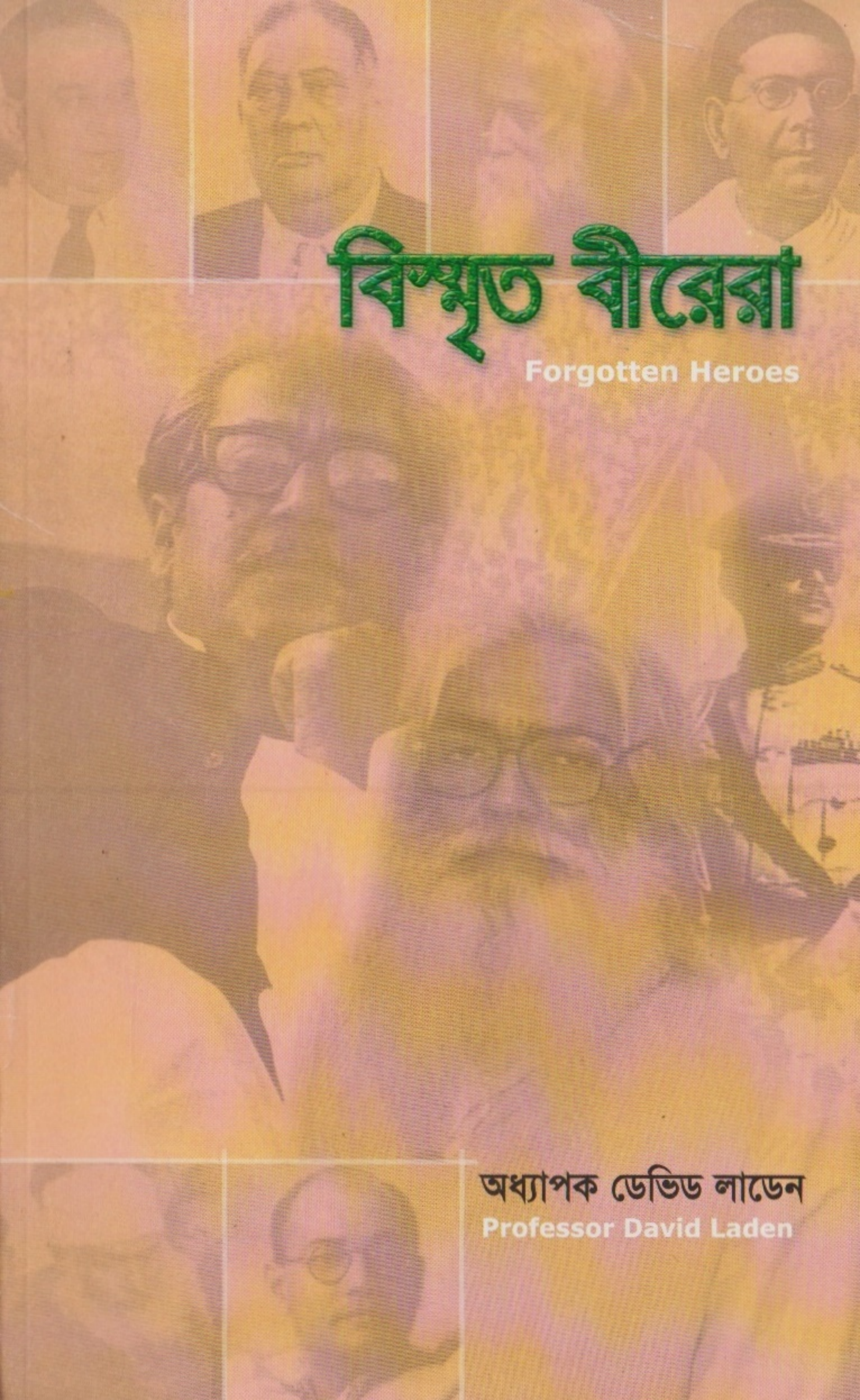

বিস্মৃত বীরেরা

Forgotten Heroes

অধ্যাপক ডেভিড লাডেন

Professor David Laden

বিস্মৃত বীরেরা

Forgotten Heroes

www.pathagar.com

বিস্মৃত বীরেরা
Forgotten Heroes

অধ্যাপক ডেভিড লাডেন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মো: সাখাওয়াত হোসেন

প্রকাশক : আরজু আহমেদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : খোন্দকার আতাউল হক

সহযোগিতায় : সামসুজ্জামান মিন্টু (সাবেক ডেপুটি মেয়র)

প্রকাশনায় : **আলোর মিছিল প্রকাশনী**
শাহবাগ চাঁদ মসজিদ কমপ্লেক্স, ২/ডি/১
ময়মনসিংহ রোড, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
জিপিও বক্স নং ৫৪২, ফ্যাক্স ৮৬১৫৫৮১, ফোন: ৯৬৬৭৯৮১।

প্রকাশকাল : ঢাকা মে, ২০১০

প্রচ্ছদ : আসিফ ইকবাল

মূল্য : ৫০.০০ টাকা।
$ 5.00 USA
£ 3.00 UK

www.pathagar.com

"ইতিহাস হচ্ছে শেখার একটি পদ্ধতি...। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা মানে বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে তাকিয়ে থাকা নয়। বরং অতীতে বিচরণ করে নিজেদের পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গির সীমারেখা সম্পর্কে উদার ও তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ নিয়ে বর্তমানে ফিরে আসা। যেসব বিকল্প আমাদের সামনে পড়ে আছে, যেসব প্রেক্ষিত আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে শাণিত করে সেগুলোকে দেখার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে একটা উদার সচেতনতা কাজ করতে হবে। আর এভাবেই অতীতের মৃত হাতের মুষ্ঠিটি শিথিল করে দিয়ে তাকে আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যতের একটি জীবন্ত অস্ত্রে পরিণত করতে পারি।"

-উইলিয়াম এপলম্যান উইলিয়ামস

"১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। সেই সামরিক শাসনের চার বছর পর ১৯৬২ সালে বাঙালিদের জন্য একটি জাতীয় বিপ্লবের ধারণা তৈরি করার লক্ষ্যে 'নিউক্লিয়াস'-এর নেতৃত্বে 'বেঙ্গল (বাংলাদেশ) লিবারেশন ফোর্স' (বিএলএফ) নামে ছাত্রদের একটি গোপন সংগঠন জন্মলাভ করে। এভাবেই ১৯৬২ সালের দিকে স্বাধীনতার প্রশ্নে তৈরি রূপরেখা দুটি রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মধ্যে অভিন্নতাও বজায় থাকে।"

-অধ্যাপক ডেভিড লাডেন

"....২৬ ও ২৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন সেগুলোর মধ্য দিয়ে আসলে ইতোপূর্বে ছাত্র ও অন্যদের দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণাসমূহেকেই পুনরায় অনুমোদন দেয়া হয়। তাদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দুটি পূর্ব পাকিস্তানের পরিসমাপ্তি এবং বাংলাদেশ নামের জাতিরাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করে।"

-অধ্যাপক ডেভিড লাডেন

"সন্দেহ নেই যে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমানের মতো নন্দিত রাজনীতিকদের বক্তব্য ও ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে একথাও সত্য, স্বাধীনতার শুরুটা ঠিক তাদের দিয়েই হয়নি। বাংলাদেশ সর্বপ্রথম স্বাধীন হয় সাহসী ছাত্র-যুব নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী অগণন অনুজ্জ্বল অনুসারীর মতো তারাও ইতিহাসে তাদের ন্যায্য স্থান থেকে বঞ্চিত।"

-অধ্যাপক ডেভিড লাডেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

অধ্যাপক ডেভিড লাডেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির ইতিহাসবিদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি এবং বেসরকারি বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের মানুষদের কাছে তিনি এমন স্বীকৃতজন যে, তাঁর মতামত উপেক্ষা করে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুবই কঠিন। আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। বাংলাদেশের মত সদ্য স্বাধীন (আমেরিকার স্বাধীনতার তুলনায়) দেশের জন্ম ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এত ব্যাপক ও গভীর যে, আজ অবধি লেখা বা ঘোষিত সকল মতামতের তুলনায় তা একেবারেই ভিন্ন। শুধু তাই নয়; প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্ম তাঁর বিশ্লেষণের আলোকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘটনাবলী এবং পরবর্তী ঘটনাসমূহকে বিচার করতে সক্ষম হবে। তাঁর এই ব্যাখ্যার কাছে এতদিন ধরে লেখা মতামত উপস্থাপনকারী লেখকদের শুধু বিপাকেই পড়তে হবে না– এক পেশী মনোভাব দিয়ে একটি জাতির জন্ম এবং বিকাশকে সঠিকভাবে চিত্রায়িত করা যে যায় না তা জেনে তাঁরা কিছুটা হলেও লজ্জিত হবেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসবিদ এবং লেখকদের কাছে তিনি কোন কিছু আশা করেননি। বাংলাদেশের ওপর তাঁর এই তথ্য উদঘাটনমূলক (Findings) রচনার শেষভাগে তিনি 'একজন মননশীল ব্যক্তির' কাছে কঠিন এক প্রত্যাশা করেছেন। তিনি তাঁর লেখায় বলেছেন, ভবিষ্যতে সেই 'মননশীল মানুষ' সঠিক ঘটনা ও তথ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস রচনা করবেন। এতে করে তিনি কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন কিনা তা বোধগম্য নয়। যে কজন সশস্ত্র যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অথবা যে কজন এখনও বেঁচে আছেন যেমন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আ স ম আবদুর রব এর মতো যাঁরা রয়েছেন তাঁদের কাছেই তাঁর সে প্রত্যাশা কিনা তা অনেকের কাছেই আগ্রহের বিষয়।

স্বাভাবিকভাবেই উল্লেখিত এই কজন বা যে কোন একজনের কাছ থেকেই সামাজিক-রাজনৈতিক-ইতিহাস বিশ্লেষণমূলক লেখা প্রজন্মের প্রত্যাশা।

এতদূরে বসেও যে গভীর এবং দ্বান্দ্বিকভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস অধ্যাপক ডেভিড লাডেন তুলে ধরেছেন সে জন্য আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে সাধুবাদ। সেই সঙ্গে 'সাপ্তাহিক বুধবার'কে বাংলা অনুবাদ এবং প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই। বইটিতে স্বাধীনতার প্রথম পতাকা, স্বাধীনতার ইশতেহার ও প্রাসঙ্গিক বেশ কিছু ছবি ব্যবহৃত হয়েছে যা তাঁর লেখারই সূত্র ধরে। পাঠকদের স্মৃতিপটে তুলে ধরার জন্য এবং নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসকে উপস্থাপনার প্রয়োজনে বাংলাদেশের জন্মলগ্নের প্রধান দুটি বিষয় স্বাধীনতার পতাকা এবং স্বাধীনতার ইশতেহার সংযুক্ত করা হলো। পরিশেষে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আরজু আহমেদ
প্রকাশক

ঢাকা, মে ২০১০

www.pathagar.com

ছবি	পৃষ্ঠা নম্বর
'নিউক্লিয়াস' পরিকল্পিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার জাতীয় পতাকা	i
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২
শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান	৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (সি আর দাশ)	৫
শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক	৫
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	৫
শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক	৬
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	৬
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	৭
'নিউক্লিয়াস' নেতা সিরাজুল আলম খান	৭
'নিউক্লিয়াস' নেতা আবদুর রাজ্জাক	৭
'নিউক্লিয়াস' নেতা কাজী আরেফ আহমেদ	৭
লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন	৭
নুরে আলম সিদ্দিকী (ছাত্র নেতা)	৮
আ স ম আবদুর রব (ছাত্র নেতা)	৮
আবদুল কুদ্দুস মাখন (ছাত্র নেতা)	৮
শাজাহান সিরাজ (ছাত্র নেতা)	৮
তোফায়েল আহমেদ (বিএলএফ নেতা)	৯
(শহীদ) স্বপন কুমার চৌধুরী	৯
আইয়ুব খান	৯
ইয়াহিয়া খান	১০
জুলফিকার আলী ভুট্টো	১০
স্বাধীনতার ইশতেহার	১২
স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলন	১৩
মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	১৪
১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	১৬
আতাউর রহমান খান	১৭
১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে 'জয় বাংলা বাহিনী'র কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান	১৯
স্বাধীনতার রূপকার সিরাজুল আলম খান	২২
বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার	২৬
প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ	২৭
'নিউক্লিয়াস' এর তিন নেতা	২৮
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এর চার নেতা	২৯
বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বি.এল.এফ-মুজিব বাহিনী) এর চার নেতা	৩০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি এখনো পর্যন্ত বিতর্কিতই রয়ে গেছে। এর একটি কারণ এ সংক্রান্ত দলিল ও প্রমাণাদি অমীমাংসিত। প্রথমে দেয়া আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটি পরবর্তীকালে দেয়া অন্য আরেকটি ঘোষণার কিছুটা পরেই মানুষের মধ্যে জানাজানি হয়। তবে পরে দেয়া ঘোষণাটি যথেষ্ট পরিমাপ দালিলিক হলেও প্রথমবারের ঘোষণাটিই ১৯৭১ সালের আগে থেকে চলতে থাকা জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে অনেক বেশি সঙ্গতিপূর্ণ। এসবসহ আরও কিছু বিষয় স্বাধীনতা ঘোষণার প্রকৃত তারিখ ও মূল ঘোষক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের একজন গবেষকের সামনে এক দালিলিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জানা ঘটনাসমূহ হচ্ছেঃ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীনতার ঘোষণা জারি করে এবং এ ঘোষণায় ২৬ মার্চ তারিখে শেখ মুজিব কর্তৃক জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাটি মেনে নেয়া হয়। ২৭ মার্চ তারিখে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। ওই সময়ে ঘোষণা দুটির মধ্যে কোনরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা দলীয় বিরোধের আভাস ছিল না। জটিল যে রাজনৈতিক ইতিহাসের আবর্তে ঘোষণা দুটি এসেছিল সেই ঐতিহাসিক কালপর্বে স্বাধীনতার আরও ঘোষণা এসেছে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন আঙ্গিকে। সেসবের তাৎপর্য, গবেষণা, বিতর্ক এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয় হিসেবে এখনো কৌতূহলোদ্দীপক। পরবর্তীকালে ১৯৭০-এর দশকের বাংলাদেশের রাজনীতি প্রথমে শেখ মুজিবের এবং পরে জেনারেল জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা দুটিকে ঘিরে প্রচণ্ড বিরোধ ও বিতর্কের জন্ম দেয়। আর তখন থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি কে দিয়েছিলেন তা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দুটি তারিখ, দুটি ঘোষণা এবং দুজন ঘোষকের নামে পুরো ব্যাপারটিই দ্বি-ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল যারা যথাক্রমে এই দুজন ব্যক্তিকেই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠাতা প্রধান হিসেবে মান্য করে।

প্রাপ্ত প্রমাণ ও দলিলাদি কাজে লাগিয়ে ঘোষণা দুটির সময় এবং স্থানের প্রেক্ষিতটি বিবেচনায় নিয়ে এদের সম্পর্কে একটি বুদ্ধিদীপ্ত ধারণা নির্ণয় করার দায়িত্ব এখন ঐতিহাসিকদের কাঁধেই বর্তেছে। আর এটি করতে গেলে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতার প্রয়োজন রয়েছে। উইলিয়াম এপলম্যান উইলিয়ামস তাঁর আমেরিকার ইতিহাসের রূপরেখা (নিউইয়র্কঃ নর্টন, ১৯৮৮, পৃঃ ১৯-২০) গ্রন্থে এই বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতার বিষয়টি বেশ চমৎকারভাবেই তুলে ধরেছেনঃ 'ইতিহাস হচ্ছে শেখার একটি পদ্ধতি...। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা মানে বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে তাকিয়ে থাকা নয়। বরং অতীতে বিচরণ করে নিজেদের পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গির সীমারেখা

www.pathagar.com

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

www.pathagar.com

সম্পর্কে উদার ও তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ নিয়ে বর্তমানে ফিরে আসা। যেসব বিকল্প আমাদের সামনে পড়ে আছে, যেসব প্রেক্ষিত আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে শাণিত করে সেগুলোকে দেখার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে একটা উদার সচেতনতা কাজ করতে হবে। আর এভাবেই অতীতের মৃত হাতের মুষ্ঠিটি শিথিল করে দিয়ে তাকে আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যতের একটি জীবন্ত অস্ত্রে পরিণত করতে পারি'।

একজন ইতিহাসবিদ ১৯৭১ সালকে যদি সুদীর্ঘ একটি অতীতের প্রেক্ষাপটে রেখে বিবেচনা করেন, তবে তিনি দেখতে পাবেন এই ভূ-খণ্ডের মানুষ শতাব্দী পরম্পরায় আরও বহুবারই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম কিংবা শব্দ চয়নের মাধ্যমে। রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ এবং ইতিহাসবিদগণ এটিও নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও 'স্বাধীনতা' বলতে কেবল একটি জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বই বোঝানো হত না। ইতিহাস বলছে, স্বাধীনতার ঘোষণাসমূহ বিভিন্ন আঙ্গিকেই প্রকাশিত হতে দেখা গেছে এবং প্রতিটি ঘোষণাই তার নিজস্ব প্রেক্ষিত অনুযায়ী সঠিক ছিল। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে এই ভূখণ্ডটি বাংলাদেশ হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এখানকার মানুষরা ওই একই কাজ করেছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ধারণাটি একটি নতুন প্রেক্ষিতে আবির্ভূত হয় যেমনটি পূর্বে আর কখনো হয়নি এবং স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টিও এ সময় নতুন এক অর্থ ধারণ করে।

১৯৭১ সালের প্রেক্ষিতটি পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা ও বিকৃত করা হয়েছে। এটিকে পুনর্গঠনের সময় আমরা যেন সেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পড়ি। স্বাধীনতার ঘোষণাগুলো বিবেচনার ক্ষেত্রে সে সময় কেবল স্মরণযোগ্য অতীতের ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে। পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা কথাটিকে যে নতুন তাৎপর্য ও মাত্রা দিয়েছে তা তখন ছিল কেবল কল্পনারই বিষয়বস্তু।

১৯০৫ সালে এক উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দিয়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি যখন ভাগ হয় তখনই পরবর্তীকালে বাংলাদেশ হিসেবে আবির্ভূত ভূখণ্ডটি নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক পরিচিতি লাভ করে। বিতর্কিত এই বিভাজন ১৯১১ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। বিভাজিত সেই উত্তরাধিকার বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, যা ১৯০৬ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি গানের অংশবিশেষ বহন করে চলেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে গীত 'আমার সোনার বাংলা' কথাগুলোর মানে কিন্তু ১৯০৬ সালে কবি যখন এটি রচনা করেন তখনকার মানে থেকে একেবারেই আলাদা। রবীন্দ্রনাথ বাংলার বিভাজনকে ঘিরেই চমৎকার ওই গানটি লিখেছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে

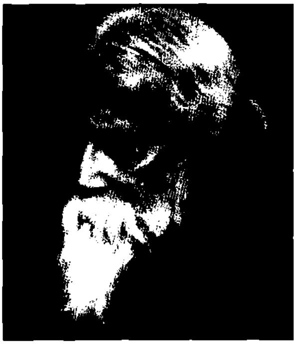
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

www.pathagar.com

'জয়বাংলা' এবং 'আমার সোনার বাংলা'র জ্বালাময়ী যুগলবন্দি নতুন এক বাংলার সৌন্দর্য এবং শক্তিকে উদ্ভাসিত করেছিল। এই বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ চিনতেন না। এই বাংলার মানুষরা স্বাধীন হওয়ার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (সি আর দাশ)

স্বাধীন বাংলা কায়েমের লক্ষ্যে চলতে থাকা রাজনৈতিক আন্দোলন ১৯০৫ সালের পর থেকে প্রতি দশকেই আরও বেশি বেগবান হচ্ছিল। যে ভূখণ্ডটি নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে সেই অঞ্চলের মানুষরা প্রতিটি নির্বাচনের মধ্য দিয়েই নিজেদের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাটিকে ব্যক্ত করেছে। ১৯২১ সালে সি আর দাশের স্বরাজ পার্টিকে সমর্থন করতে গিয়ে তারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩৭ সালেও এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিকে সমর্থন করতে গিয়ে প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেসকে। এই কৃষক প্রজা পার্টিই ১৯৪১ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেয়।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

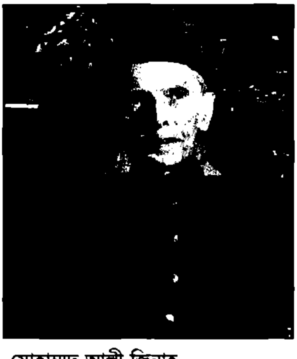

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১৯৪৬ সালে তারা মুসলিম লীগকে সমর্থন জানায়। ভারত কিংবা পাকিস্তান বেছে নেয়ার প্রশ্নে ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত একমাত্র গণভোটে সিলেট অঞ্চলের মানুষরা পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয়।

১৯৪৭ সালের পর, তখনকার পাকিস্তানে একেবারেই নতুন একটি রাষ্ট্রীয় সীমারেখা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার পুরনো আকাঙ্ক্ষাটি নবরূপে আবির্ভূত হয়। পূর্ব পাকিস্তান নতুন একটি জাতীয় সত্তা লাভ করে। ১৯৫০-এর দশকের প্রথম দিকেই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম একটি নতুন জাতির আত্মপ্রকাশের গণআকাঙ্ক্ষাটি ভাষা পায়। ১৯৬০-এর দশকে এসে এর মধ্যকার রাজনৈতিক অভিলাষটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সমসাময়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নামক যে ধারণাটি জন্মলাভ করে তা কিন্তু ওই সময় থেকেই সুস্পষ্ট দুটি রূপরেখা অনুসরণ করে এগুচ্ছিল।

একটি রূপরেখা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। এটি অনেকটা ১৯৪১ পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের ধারণার মতোই। স্বাধীনতার এই সাংবিধানিক রূপরেখাটি জন্মলাভ করেছিল নির্বাচনী রাজনীতির আবহে এবং তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার বিষয়টি ছিল। ধারণা করা হয়েছিল এই রূপরেখাটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবে।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

অন্য রূপরেখাটি জন্ম নিয়েছিল সাংবিধানিক রাজনীতির বাইরে, যার একটি ঋজু খুঁজে পাওয়া যায় ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের কাছ থেকে পুরোপুরি স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাটির সঙ্গে। এছাড়া ১৯৪১ সালের পর মুসলিম লীগ স্বাধীনতার ডাকে দ্বি-জাতিতত্ত্বের যে রূপরেখা তুলে ধরেছিল তার সঙ্গেও এটির মিল লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার প্রশ্নে জনপ্রিয় এই রূপরেখাটিই নতুন বাঙালি জাতিসত্তার জন্য একটি জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণার জন্ম দেয়। পূর্ব পাকিস্তানে সেই বাস্তবতাই দৃশ্যমান হলো।

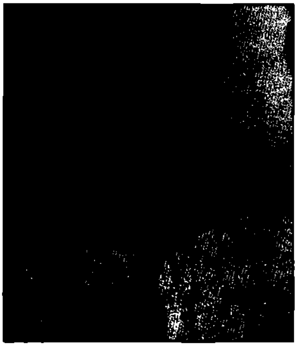
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

স্বাধীনতার প্রশ্নে এই দুই রাজনৈতিক রূপরেখা যুক্তরাষ্ট্র এবং সার্বভৌমত্ব দুটিরই উদ্ভব আলাদা-আলাদাভাবে এবং দুটিরই আবেদন তৈরি হতে থাকে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। তদুপরি উভয়পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হতে থাকে এবং ব্রিটিশ-ভারত সময়কার মতোই পাকিস্তান আমলেও নিজেদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে তারা অভিন্নতা রক্ষা করে চলছিল। ১৯৫২ সালে ছাত্ররা ভাষা আন্দোলন করে এবং এর মধ্য দিয়ে সাংবিধানিকতার বাইরে বাঙালি হিসেবে রাজনীতি করার জনপ্রিয় একটি ভিত্তি তৈরি হয়।

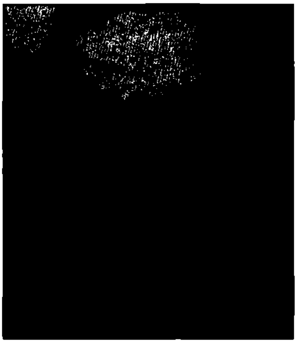
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতি রায় প্রদানের মাধ্যমে ভোটাররা আবারও তাদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায়। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগ ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ২১ দফা সম্বলিত একটি দিকনির্দেশনা প্রণীত হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের নতুন সংবিধান স্বায়ত্তশাসনের ধারণাটি বাতিল করে দিলে আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুল হামিদ খান ভাসানী বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাগুলো যদি যথাযথভাবে

www.pathagar.com

বিবেচিত না হয় তাহলে বাঙালিদের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। সেই সামরিক শাসনের চার বছর পর ১৯৬২ সালে বাঙালিদের জন্য একটি জাতীয় বিপ্লবের ধারণা তৈরি করার লক্ষ্যে 'নিউক্লিয়াস'-এর নেতৃত্বে 'বেঙ্গল (বাংলাদেশ) লিবারেশন ফোর্স' (বিএলএফ) নামে ছাত্রদের একটি গোপন সংগঠন জন্মলাভ করে। এভাবেই ১৯৬২ সালের দিকে স্বাধীনতার প্রশ্নে তৈরি রূপরেখা দুটি রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মধ্যে অভিন্নতাও বজায় থাকে।

'নিউক্লিয়াস' নেতা সিরাজুল আলম খান

'নিউক্লিয়াস' নেতা আবদুর রাজ্জাক

'নিউক্লিয়াস' নেতা কাজী আরেফ আহমেদ

১৯৬০-এর দশকে এসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য অনেক বেড়ে যায়। এ সময়ই এক পাকিস্তানের মধ্যে আলাদা দুই অর্থনীতি ও দুই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ধারণাটি পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জন্মলাভ করে। স্বাধীনতার প্রশ্নে ভিন্ন ধরনের যে দুটি রূপরেখার ধারণা প্রচলিত ছিল সে দুটির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সমন্বয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল খুবই প্রভাব বিস্তারী। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাঙালি সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতেই কার্যত এক পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই 'দুই রাষ্ট্রতত্ত্ব'-এর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নাটকীয়ভাবেই প্রমাণ হয়ে গেল যে, সামরিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান কতটা নাজুক অবস্থায় রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের চেহারাটি তুলে ধরার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে তার ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনেরও দাবি জানান। ১৯৬৭ সালে আইয়ুব খান সরকার শেখ মুজিব ও অন্য ৩৪ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগ আনে। এতে বলা হয়, অভিযুক্তরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় (রাষ্ট্র

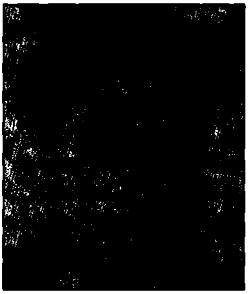
লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন

www.pathagar.com

বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য) শেখ মুজিবকে ১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে ১৯৬৯ সালের ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় তিন বছর জেলে কাটাতে হয়। এই সময়ের মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৬৮ সালে বাম রাজনীতিক ও ছাত্ররা স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি প্রকাশ করে। তারা 'স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম কর' স্লোগান দেয়। সাংবিধানিক ধারার নেতৃত্বকে কারাবন্দি করে রাখার কারণে সার্বভৌমত্ব অর্জনের গণদাবিটি সামনে চলে আসার একটি রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি হয়ে যায়। এটি ফেডারেল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দাবিকে আরও বেগবান করে তোলে।

নুরে আলম সিদ্দিকী (ছাত্র নেতা)

আ স ম আবদুর রব (ছাত্র নেতা)

১৯৬৯ সালে ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে নতুন এক গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। তাতে ফেডারেল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পাশাপাশি আবেগমথিত কণ্ঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদেরও ডাক দেয়া হয়। জানুয়ারির ৪ তারিখে নতুন সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (এসসিএসপি) পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে ১১-দফা সনদ ঘোষণা করে এবং 'জাগো, জাগো বাঙালি জাগো', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'তোমার দেশ, আমার দেশ, 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' প্রভৃতি ধ্বনিতে স্বাধীনতার ডাক দেয়। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনির পরিবর্তে এ সময় 'জয়বাংলা' ধ্বনিটি সর্বসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আবদুল কুদ্দুস মাখন (ছাত্র নেতা)

শাজাহান সিরাজ (ছাত্র নেতা)

গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ২২ জানুয়ারি আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের সম্মানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

www.pathagar.com

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল এক জনসভার আয়োজন করে। এসসিএসপি নেতা তোফায়েল আহমদ এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় শেখ মুজিবকে জাতীয়তাবাদী উপাধি 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত করার জন্য তোফায়েল আহমদ প্রস্তাব করেন। সমবেত উদ্বেলিত জনতা কর্তৃক তা গৃহীত হয়। রেসকোর্সের সব প্রান্ত থেকে 'জয়বাংলা' ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে এবং গণমাধ্যমগুলোতেও তা গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হতে থাকে।

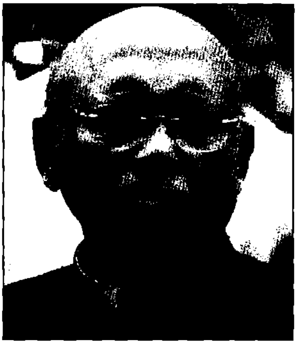
তোফায়েল আহমেদ (বিএলএফ নেতা)

সেদিন থেকেই ছাত্রদের কর্মকাণ্ডের গণসম্পৃক্তির পাশাপাশি শেখ মুজিবের সন্মোহনী ভাবমূর্তি ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বাধীনতার প্রশ্নে এই দুপক্ষের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত অভিন্নতা না থাকলেও এই আন্দোলন শেখ মুজিবকে যেমন শক্তি যোগাচ্ছিল তেমনি তিনিও ছাত্রদের আশা-ভরসার স্থলে পরিণত হন এবং তাদের আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন যোগাতে থাকেন। গণ-আন্দোলনের ওপর আস্থাশীল হয়ে বঙ্গবন্ধু এভাবেই তার সংবিধানপন্থী রূপরেখাটিকে এগিয়ে নেয়ার কাজে তৎপর হন। ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ তিনি রাওয়ালপিন্ডি গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ফেডারেশন পরিকল্পনার ৬-দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা প্রস্তাবটিকে পাকিস্তান ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা অভিহিত করে প্রত্যাখ্যান করেন। স্বাধীনতার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানে আলাদা দুটি রূপরেখার ধারণা চলমান ছিল। তবে ১৯৬৯ সালে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের সামনে সে দুটি ধারার মধ্যে কোনোরকম ভিন্নতা আর দৃশ্যমান ছিল না এবং ১৯৫৪ সালে না হলেও অন্তত ১৯৬৬ সাল থেকেই এমন একটি অবস্থা সেখানে বিরাজমান ছিল বলে মনে করা যায়। ১৯৬৯ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু উভয় ধারারই প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন যদিও তিনি নিজে সংবিধানপন্থী ধারাটির পক্ষেই ছিলেন।

(শহীদ) স্বপন কুমার চৌধুরী

ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান

১৯৬৯ সারের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। নভেম্বরের ২৮ তারিখ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা

www.pathagar.com

দেন, পরের বছরই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। 'এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি'র অধীনে এক কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদের ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে ১৬২টি আসন এবং অপ্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ৫টি মহিলা আসন। তখন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ঝড়ো অধ্যায়ের সূচনা এবং স্বাধীনতা পরিকল্পনার দুটি রূপরেখাই অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

নিজের ফেডারেল পরিকল্পনাটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে এক নির্বাচনী বক্তৃতায় শেখ মুজিব একটি ফেডারেল সংবিধান প্রণয়নে পাকিস্তানের ভোটারদের সহযোগিতা চাইলেন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের মতই নাটকীয়ভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরও একবার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের চিত্রটি তুলে ধরলো। ফলে পূর্বাংশের স্বাধীনতার দাবিটি আরও বেশি জোরালোভাবে উচ্চারিত হতে থাকল।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় জেলাগুলোতে ভয়াবহ এক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তরা সরকারের কাছ থেকে যে সাহায্য পায় তা কেবল নামমাত্র। ২৩ নভেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় মওলানা ভাসানী বলেন, আগেকার ঘটনাসমূহ এবং ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্তদের প্রতি সরকারের বর্তমান নির্বিকারত্ব এটাই প্রমাণ করে, পাকিস্তান ইতোমধ্যেই কাণ্ডজ্ঞানহীন এক নির্বোধে পরিণত হয়েছে। 'পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি উচ্চারণ করে তিনি তার বক্তৃতা শেষ করেন। এর তিনদিন পরই ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত অঞ্চল সফর করে এসে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিব এই মর্মে ঘোষণা দেন, ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্তদের সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের এই ব্যর্থতা যতটা না ইয়াহিয়া খান শাসনের ব্যর্থতা, তারচেয়ে বেশি পাকিস্তান রাষ্ট্রের ব্যর্থতা। পূর্ব পাকিস্তানকে অবশ্যই তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন করতে হবে। সম্ভব হলে ভোটের মাধ্যমেই। আর যদি প্রয়োজন হয় তবে বুলেটের মাধ্যমেও বলে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন। এক সপ্তাহ পর ৪ ডিসেম্বর ছাত্রলীগ রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবি তোলে এবং নতুন দুটি স্লোগান দিতে শুরু করে। স্লোগান দুটি যথাক্রমে: 'কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' (বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর); গণবাহিনী তৈরি কর [জনগণের শক্তি] বাংলাদেশ স্বাধীন কর

জুলফিকার আলী ভুট্টো

www.pathagar.com

(জয়বাংলা বাহিনী তৈরি কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর)।

এভাবেই ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনের সময় পূর্ব এবং একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মনের মধ্যে স্বাধীনতার দুটি রূপরেখাই এই অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের মাধ্যমে একাকার হয়ে যায়। তারপরও তাদের অভিন্ন বলা যায় না, কারণ রাজনৈতিকভাবে তারা একীভূত ছিল না। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল ৬-দফাভিত্তিক ফেডারেল শাসনের পক্ষে জনমতের আনুষ্ঠানিক সমর্থনের প্রতিফলন। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টিতে জয়ী হয় এবং ৩০০ আসনের জাতীয় পরিষদের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে।

আগে সাংবিধানিকতার যে জনপ্রিয় আবেদনটি ছিল তা আবার ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি নিজস্ব চেহারায় যথাস্থানে আবির্ভূত হয়। ওইদিন রমনার রেসকোর্স ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সব জনপ্রতিনিধি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এক সভায় মিলিত হয়ে আওয়ামী লীগের ৬-দফা এবং সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষিত ১১-দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণ করেন। দুটি কর্মসূচিকেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিধিদের উপর অর্পিত জনগণের আমানত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আজকের দিনে পেছন ফিরে তাকালে আমরা বুঝতে পারি যে, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের প্রথমদিককার ঘটনাগুলোই বস্তুত একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান টিকে থাকার সব ধরনের বাস্তব সম্ভাবনা শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি সে সময় এতটা নিশ্চিত বলে মনে হয়নি। এমনকি শেখ মুজিবের কাছেও তা সেভাবে ধরা পড়েনি। তিনি তখনো তার ফেডারেশন পরিকল্পনায় স্থির ছিলেন, যেটি সাংবিধানিক নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত নির্বাচনী বিজয় ও বিপুল জনসমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দরজায় দাঁড়িয়ে। সব দিক বিবেচনায় তখনো তাঁর আশাবাদী থাকার কথা। কিন্তু দ্রুতই হতাশার নতুন কারণ হাজির হতে শুরু করল।

মার্চ মাসের ৩ তারিখে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে বলে ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার মাত্র তিনদিনের মাথায় জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা দেন, আওয়ামী লীগের ৬-দফা প্রস্তাবের মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্যাদি যদি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা না হয় তবে তার দল ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে পারবে না। ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখে শেখ মুজিব ভাষা শহীদদের স্মারক ঢাকার শহীদ মিনারে যান এবং ৬-দফার ভিত্তিতে প্রণীত পাকিস্তানের ফেডারেল শাসনব্যবস্থার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি এই ঘোষণাও দেন যে, বাঙালির অধিকার ও স্বার্থের বিরুদ্ধে যদি কোনোরকম চক্রান্ত চালানো হয় তবে তা মোকাবিলার জন্য সব বাঙালিকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। ঠিক পরের দিনই সেই চক্রান্তের আবির্ভাব ঘটে: ইয়াহিয়া খান তার মন্ত্রিসভা বাতিল করে দিয়ে জেনারেলদের নিয়ে এক সভা করেন এবং সংকট সমাধানে নিজস্ব পথে এগুনোর সিদ্ধান্ত নেন।

www.pathagar.com

এর দুদিন পরই ১৯৭১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব এক সংবাদ সম্মেলন ডেকে ঘোষণা দেন, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও স্বশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে লড়াই চালিয়ে যাবে। ফেব্রুয়ারি ২৮ তারিখ শেখ মুজিব পাকিস্তানের জন্য নতুন একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে তাকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সব নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ঢাকা অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। একই দিনে জেড এ ভুট্টো তার দল ঢাকা অধিবেশন বর্জন করবে বলে হুমকি দেন। এর পরদিনই ১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করেন।

অধিবেশন বাতিলের ঘোষণা ঢাকা ও চট্টগ্রামে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। ঢাকার পূর্বাণী হোটেলে আওয়ামী লীগ পরিষদীয় দলের সভা চলাকালে বাইরে সমবেত হাজার হাজার মানুষ অতিদ্রুত সার্বভৌম জাতীয় স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি দাবি জানাতে থাকে। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে ফেলে। ছাত্রনেতারা স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি উচ্চপর্যায়ের সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। এর নেতা নূর-ই আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব এবং আবদুল কুদ্দুস মাখন জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে যৌথ নেতৃত্ব প্রদানের ঘোষণা দেন।

স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণাটি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসেই প্রথম রাজনৈতিকভাবে স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর সাংগঠনিক শক্তি ও গণ-আবেদনের বিষয়টি এতদিন সাংবিধানিকতার বাইরে এর উৎসস্থল ছাত্রদের মধ্যেই সীমিত ছিল। এ ছাত্র সংগঠনগুলোই এর উত্থানে এতদিন শক্তি যুগিয়েছে। কিন্তু এখন এটি সরকারি মহলের প্রভাবশালী বাঙালির মধ্যে সাড়া জাগাতে শুরু করে। মার্চ মাসের ২ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ঢাকা শহর ও এর আশপাশ এলাকা থেকে অসংখ্য মানুষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এসে জড়ো হয়। জনতা জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষে সুর তোলে। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং সমবেত হর্ষোৎফুল্ল জনতার মুহুর্মুহু: 'জয়বাংলা' ধ্বনির মধ্যে ছাত্রলীগ নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। পরদিন ৩ মার্চ স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে। সেখান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত একটি ইশতেহার (ঘোষণাপত্র) পাঠ করা হয়। ইশতেহারে বলা হয়:

ঐতিহাসিক ৩ মার্চ ১৯৭১, পল্টন ময়দানে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ

www.pathagar.com

২ মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হাজারো ছাত্রজনতার সমাবেশে স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলন করছেন ডাকসু'র ভিপি আ স ম আবদুর রব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন।

www.pathagar.com

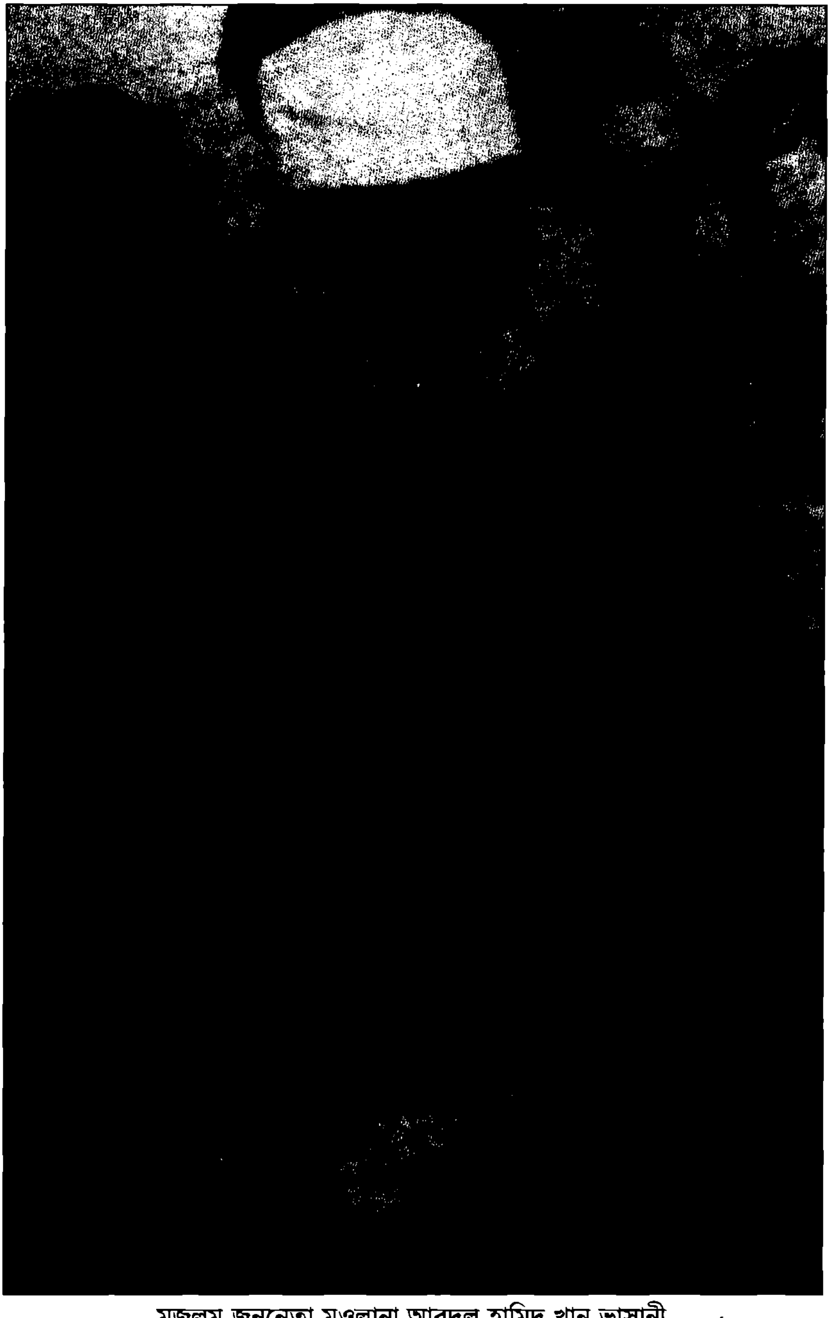

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

www.pathagar.com

'জয়বাংলা : স্বাধীনতার ঘোষণা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলো। এটি এখন একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ...। ৫৪,৫০৬ (বর্গ) মাইল আয়তনের এই ভূখণ্ডটির নাম বাংলাদেশ...।' স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিটি গ্রাম, শহর ও নগরে প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। তারা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গাইতে থাকেন।

মার্চ মাসের ৪ তারিখ সারা পূর্ব পাকিস্তানে এক সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন এবং গণমাধ্যম তাদের কর্মকাণ্ড স্থগিত রাখে। বাঙালি-বিহারি সংঘর্ষে মৃত্যুর ঘটনা এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও ঢাকায় সেনাবাহিনীর আক্রমণের মধ্য দিয়ে আসন্ন যুদ্ধের হিংসাত্মক আলামত দেখা দিতে শুরু করে। মওলানা ভাসানী প্রকাশ্যে জাতীয় স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করেন। মার্চ মাসের ৫ তারিখ পাকিস্তান সেনাবাহিনী টঙ্গীতে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায়। চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর আক্রমণে এবং বিভিন্ন স্থানে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গায় আরও বহু মানুষ মারা যায়। বিক্ষোভকারীরা সেনাবাহিনীর চলাচল রোধ করার জন্য রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এবং টঙ্গীর কাঠের পুলটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ঢাকায় ছাত্ররা লাঠি হাতে বিশাল মিছিল বের করে। বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীরা জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শপথ নেন। মার্চের ৬ তারিখে জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। জনতা যশোরে সেনাবাহিনীর পিছু ধাওয়া করে। সেখানে তখন বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা চলছিল।

গণ-আন্দোলনের মুখে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দেন, ২৫ মার্চ তারিখে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। তদসত্ত্বেও আওয়ামী লীগসহ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এমনি এক অবস্থায় শেখ মুজিব হয়ত ভেবেছিলেন, তার ৬-দফা দাবি যদি আবারও লাগিয়ে দেশের জন্য একটি ভবিষ্যৎ ফেডারেল ব্যবস্থার দ্বার খুলে দিতে পারবেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঘটনাবলি শেখ মুজিবের রাজনৈতিক অবস্থানকে নাটকীয়তার তুঙ্গে নিয়ে যায়। কারণ, ওই সময় পাকিস্তান বিরোধী গণজাগরণের মধ্যমণি হিসেবে একদিকে তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির সব আশা-ভরসার মূর্ত প্রতীক আর অন্যদিকে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধিদের নেতা হিসেবে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। ৭ মার্চ লাখ লাখ মানুষ 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিতে দিতে রমনার রেসকোর্স ময়দানে হাজির হয় তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য। তাদের হাতে ছিল লাঠি এবং সেগুলো উঁচিয়ে ধরে জানিয়ে দেয়, যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত। বক্তৃতায় শেখ মুজিব তার ৬-দফা কর্মসূচি ও জাতীয় পরিষদে যোগদানের বিষয়ে দেয়া শর্তাদি বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যতক্ষণ না পাকিস্তানের শাসকরা তাঁর শর্তগুলো মেনে নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত সব অফিস, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দিচ্ছেন, '...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

www.pathagar.com

থাকবে এবং সরকারের দেয়া সবধরনের সহযোগিতা স্থগিত থাকবে। তিনি প্রতিটি ঘরকে দুর্গে পরিণত করে 'যার হাতে যা কিছু আছে' তাই দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য জনগণকে নির্দেশ দেন। তিনি 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে তার বক্তৃতা শেষ করেন। তাঁর এই উদ্দীপনামূলক ভাষণের অর্থ ছিল দ্বি-মাত্রিক। তিনি সাংবিধানিকতা ও মুক্তির সংগ্রাম কথা দুটি দিয়ে স্বাধীনতাকে দুটি অর্থে উপস্থাপন করেন। তবে বক্তব্যের অস্পষ্টতা সত্ত্বেও তাঁর সেই যুগান্তকারী ভাষণ সাংবিধানিক রাজনীতির বাইরে গিয়ে তীব্র এক গণ-আন্দোলনের জন্ম দেয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় চলে আসে এবং অনেক রাজনৈতিক নেতাও সুস্পষ্ট ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম এক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেন। মার্চের ৮ তারিখেই অসহযোগ আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সব আর্থিক লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তান রেডিও, টেলিভিশন এবং প্রশাসন শেখ মুজিবের কথা মতো চলতে শুরু করে। ৯ মার্চ ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকৃতি জানান। ছাত্রলীগ স্বাধীনতার একটি ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে এবং একটি জাতীয় সরকার গঠনের জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানায়। পল্টন ময়দানের জনসভায় মওলানা ভাসানী ও আতাউর রহমান খান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। নিজের স্বাক্ষরযুক্ত ও সভাস্থলে প্রচারিত একটি লিফলেটে ভাসানী 'স্বাধীনতা' বলতে পুরোপুরি জাতীয় সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করেন।

আতাউর রহমান খান

১০ মার্চ আতাউর রহমান খান অতি দ্রুত একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানান। ১১ মার্চ বাঙালিদের নিয়ে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস সংগঠনসমূহ শেখ মুজিবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ১৪ মার্চ স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সব ধরনের সামরিক সরবরাহ এবং পশ্চিম পাকিস্তানমুখী পরিবহন যান চলাচল বন্ধ করার লক্ষ্যে ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে চেক পয়েন্ট বসিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আতাউর রহমান খান আবারও একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানান।

মার্চের ১৫ তারিখে ইয়াহিয়া খান শীর্ষ পর্যায়ের জেনারেল ও কর্মকর্তাদের নিয়ে ঢাকায় আসেন। এ সময় স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা দেয়, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, পাকিস্তান সরকারের কোনো অধিকারই নেই এটিকে শাসন করার এবং বাংলাদেশ এখন থেকে শুধু তার নির্বাচিত

www.pathagar.com

নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশই মেনে চলবে। এটি জনগণের প্রতি সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেয়ারও আহ্বান জানায়। তৎসত্ত্বেও শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং সাময়িক বিরতিসহ ২৫ মার্চ পর্যন্ত তা চলে। অনুগত অনুসারীদের নেতৃত্বে চলতে থাকা গণ-আন্দোলনের মধ্যে শেখ মুজিব সাংবিধানিক পথে এগুতে থাকলেও জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণাটি মাথায় রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেটিই জাতিকে ভিন্ন এক পথে নিয়ে যায়।

শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকা অবস্থায় (অসহযোগ) গণ-আন্দোলনের তৃতীয় সপ্তাহে পৌঁছায়। ১৮ মার্চ স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতাকে সমর্থন জানাতে বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানায়। ১৯ মার্চ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। গাজীপুরের সমরাস্ত্র কারখানা ও জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ২০ মার্চ চট্টগ্রামে আহূত এক সংবাদ সম্মেলনে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করার জন্য ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারই ঠিক করবে স্বাধীন বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক রাখবে। ২২ মার্চ সংবাদপত্রসমূহে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ছবি ছাপা হয়।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চের পাকিস্তান দিবসটি বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা দিবসে পরিণত হয়। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে জনগণ পাকিস্তান দিবস প্রত্যাখ্যান করে এবং বাড়ি-ঘর, অফিস ও যানবাহনে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেয়। পল্টন ময়দানে জয়বাংলা বাহিনী এক স্বাধীনতা কুচকাওয়াজের আয়োজন করে। এখানে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ ইউনিফর্ম পরিহিত সেনাদলের কাছ থেকে অভিবাদন গ্রহণ করে এবং সেখানে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানানোর পাশাপাশি জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়া হয়। ১০ প্লাটুন সৈনিক এবং জয়বাংলা বাদক দল স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে কুচকাওয়াজ করতে করতে শেখ মুজিবের বাড়িতে পৌঁছে এবং সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। ২৪ মার্চ যশোরের ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সদর দফতরে সৈনিকরা জয় বাংলা স্লোগান দেয় এবং জাতীয় পতাকাকে সালাম জানায়।

২৫ মার্চ হরতাল, অসহযোগ, বিক্ষোভ, জনসমাবেশ এবং প্রকাশ্য ঘোষণা দান কর্মসূচি ১৮তম দিবসে পৌঁছায়। এসব কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কার্যকরভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল। সামরিক সরঞ্জামাদি ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে করাচি থেকে ছেড়ে আসা জাহাজ সোয়াতের মালামাল খালাস করতে সেদিনই চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিক ও কর্মকর্তারা অস্বীকৃতি জানায়। চট্টগ্রামের মানুষ পাকিস্তানি সৈন্যদের চলাচল রুদ্ধ করে দেয়ার জন্য প্রধান প্রধান সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইয়াহিয়া খান ও পশ্চিম

www.pathagar.com

জয় বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন, স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা- নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। ছাত্রলীগ নেতা হাসানুল হক ইনু স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করছেন এবং 'জয় বাংলা বাহিনী'র ডেপুটি কমান্ডার কামরুল আলম খান খসরু 'গান ফায়ার' করে স্বাধীনতার 'এক দফাকে' সামনে এনে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন।

www.pathagar.com

পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ঢাকা ত্যাগ করলে মধ্যরাত থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে।

এসব ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার মঞ্চ তৈরি করে। সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বলা হয়, বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করে যাচ্ছে। মধ্যরাতের কিছু পরেই শেখ মুজিবুর রহমান তার বাসভবন থেকে সহকর্মীদের উদ্দেশে একটি বার্তা পাঠান এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান রেডিওতে যে বার্তাটি তিনি পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায় তা হলো:

'হয়তোবা এটিই আমার জীবনের শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি এই মর্মে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে, আপনারা যে যেখানে থাকুন, যার কাছে যাই কিছু থাকুক তা দিয়েই দখলদার সেনাবাহিনীকে শেষ পর্যন্ত মোকাবিলা করে যাবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শেষ সৈন্যটি বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।'

২৭ মার্চ তারিখে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিম্নোক্ত বার্তাটি প্রচার করেন:

'বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মির অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আরও জানানো যাচ্ছে যে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আমরা ইতোমধ্যেই একটি সার্বভৌম ও আইনানুগ সরকার গঠন করেছি। এ সরকার আইন ও সংবিধান মেনে চলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন এই গণতান্ত্রিক সরকার জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এটি বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে চলবে। আমি বিশ্বের সব দেশের সরকারগুলোকে বাংলাদেশে চলতে থাকা নৃশংস গণহত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে নিজ নিজ দেশের জনমতকে সংগঠিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশের সার্বভৌম বৈধ সরকার এবং পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।'

মার্চের ৩০ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আবারও বাংলাদেশের যুদ্ধরত জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসতে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখানকার বেসামরিক নিরাপরাধ মানুষকে যেভাবে হত্যা করছে তা বন্ধ করতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ' আমি আবারও হস্তক্ষেপ করতে এবং সরাসরি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে জাতিসংঘসহ বিশ্বের পরাশক্তিসমূহের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। এক্ষেত্রে বিলম্ব আরও লাখ লাখ মানুষের জীবনহানি ঘটাবে।'

www.pathagar.com

১০ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার স্বাধীনতার যে ঘোষণাটি দেয় তা নিম্নরূপ:

'আমরা, বাংলাদেশের জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা, জনগণ কর্তৃক জনগণের ইচ্ছাই সর্বোচ্চ বা পরম হিসেবে বিবেচিত– আমাদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা বলে আইনানুগভাবে একটি সংবিধান প্রণয়ন পরিষদ গঠন করেছি। আমরা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং ঘোষণা করছি। সেই সাথে ইতোমধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাকে নিশ্চিত করছি। আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি সংবিধান প্রণীত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল থাকবেন। প্রেসিডেন্ট হবেন প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক'।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর আনুষ্ঠানিকভাবে জারিকৃত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাসমূহকে সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেক্ষিত বিবেচনায় প্রথম নয়, বরং শেষের বলেই মনে হয়। লিখিত ইতিহাস বলছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাটি এসেছে বরং ছাত্র নেতৃবৃন্দের কাছ থেকেই, এরাই এর উদগাতা। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতিসত্তাটিকে তারাই প্রথম 'বাংলাদেশ' হিসেবে অভিহিত করেছে। এর আগে পর্যন্ত কেবল সাহিত্যের পাতায়ই শব্দটি অস্তিত্বমান ছিল। এই শব্দটিকেই তারা নতুন করে সার্বভৌমত্বের প্রতীকী তাৎপর্যে ব্যবহার করেছে। রাজনীতিবিদদের চেয়ে ছাত্রনেতারাই বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আগে দিয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ও প্রচারে ব্যবহৃত স্লোগানসমূহের তারাই উদগাতা এবং এসব স্লোগান তাদের মুখেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। গণআকাঙ্ক্ষাটি তারাই ধরতে পেরেছিল। সিরাজুল আলম খানকে ছাত্রলীগ এবং গোপন সংগঠন বেঙ্গল (বাংলাদেশ) লিবারেশন ফ্রন্টের (বিএলএফ) গুরু হিসেবে বিবেচনা করা হত। তাঁর মত ছাত্র-যুব নেতারাই সেসময় জাতি-রাষ্ট্রের প্রভাবশালী চিন্তক হিসেবে আবির্ভূত হন। ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ছাত্রনেতাদেরই অর্জন।

তবে একথাও সত্য, ছাত্রদের একার পক্ষে লক্ষ্য অর্জন কখনো সম্ভব হত না। তারা তাদের সার্বভৌমত্বের স্বপ্নটি আওয়ামী লীগের সাংবিধানিকতার সঙ্গে একীভূত করে নিয়েছিল। তারা শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে তার পেছনে একত্রিত হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে এক সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও শেখ মুজিবের তাতে সায় ছিল না। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে থাকলে বিভিন্ন দলমতের বহু রাজনীতিবিদ আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিতে শুরু করেন। শেখ মুজিব ছাত্র রাজনীতিকদের সাদরে গ্রহণ করেন

www.pathagar.com

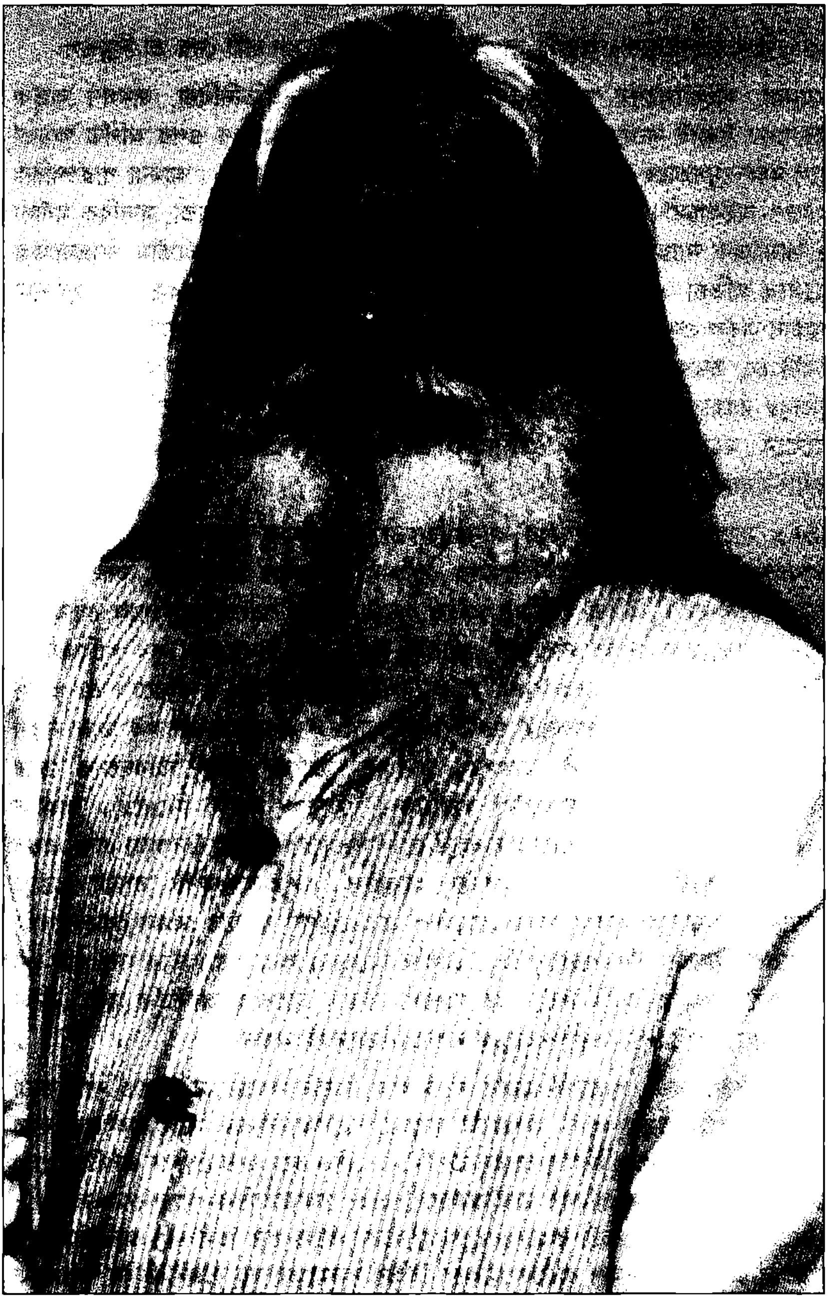

স্বাধীনতার রূপকার সিরাজুল আলম খান

www.pathagar.com

এবং এমন কী রক্ষণশীল রাজনীতিকরা বিপ্লবীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। এ সময় রাজনীতির মঞ্চে বাম থেকে ডান পর্যন্ত সব মত ও পথের রাজনৈতিক স্বার্থই অভিন্নখাতে বইতে শুরু করে যার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকেই তার ভাবমূর্তি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। বিশেষ করে তার ৬-দফা কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তান রাজনীতির মূল কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হলে তিনিও এর অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ একটি সামরিক একনায়কতান্ত্রিক অবস্থার মধ্যেও পাকিস্তানের জন্য একটি ফেডারেল সংসদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোট দেয়। এর মধ্য দিয়ে আবারও তারা তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটি প্রকাশ করে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের পক্ষে কথা বলার একক নেতা হিসেবে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সব জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে শপথ গ্রহণ করান। এখানে তিনি পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রে পুনর্বিন্যস্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এটি অনেকটা মুসলিম লীগের ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মতোই ছিল। তা সত্ত্বেও মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালে যেটিকে একটি সম্ভাবনা হিসেবে দেখেছিলেন ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণা দিলে সেটিই একটি বাস্তবতারূপে ধরা দেয়। আর এর মধ্য দিয়েই একটি ফেডারেল পাকিস্তান টিকে থাকার সব ধরনের বাস্তব সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।

শেখ মুজিবের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের সেই বিখ্যাত ভাষণটি বস্তুত অনেকের কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে প্রতিভাত হলেও অনেকেই আবার এর অস্পষ্টতার কারণে হতাশ হয়। তবে সেই মুহূর্তে জনগণ যে ৬-দফাকে পশ্চাতে ফেলে রেখে এসেছে তা বোঝা যায়। ১৪ মার্চের পর অনেক রাজনীতিকই জয়বাংলা ইশতেহারের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং অনেকেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এমন কী খান এ সবুর ও নূরুল আমীনের মত প্রবীণ রাজনীতিবিদও স্বাধীনতাকে সমর্থন করেন। শেখ মুজিবই তখন ৬-দফার ভিত্তিতে ফেডারেল সরকার গঠন নিয়ে কথা বলার একক মুখপাত্রে পরিণত হন। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যখন যুদ্ধের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করছিল এবং সারাদেশে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করছিল শেখ মুজিব তখন ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠক করছিলেন।

২৫ মার্চের আগের সময়গুলোতে ছাত্র, পেশাজীবী, আমলা এবং রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলো কর্তৃক সার্বভৌম জাতীয় স্বাধীনতার ঘোষণাসমূহ তখন আর কেবল বাগাড়ম্বর ছিল না। ঘোষণাসমূহের বাগবৈশিষ্ট্যগত বৈচিত্র্য এগুলোকে আরও বেশি অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলছিল। ২৫ মার্চের আগে জনসাধারণের প্রদর্শিত ও প্রচারিত স্বাধীনতার মর্ম ধারণকারী প্রতীকীগুলোকে মুজিবনগর সরকার স্বীকৃতি দেয় এবং

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সংবিধানে সেসব অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যেমন এসবের মধ্যে ছিল জাতি বা রাষ্ট্রের নাম, শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু খেতাব প্রদান এবং জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চের পাকিস্তান দিবস জনগণ কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে 'বাংলাদেশ দিবস'-এ পরিণত হয়। সাধারণ মানুষ সারাদেশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। জয় বাংলা বাহিনী পল্টন ময়দানে স্বাধীনতা কুচকাওয়াজের আয়োজন করে। এতে সৈনিকরা অভিবাদন প্রদান করে এবং 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। বৈপ্লবিক উৎসবমুখরতা স্বাধীনতার স্বপ্নকে সেদিন এতটাই দৃশ্যমান করে তুলেছিল যে, আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এম ইউসুফ আলী পরে ১১ মে তারিখে যে বঙ্গবন্ধুই প্রকৃতপক্ষে ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বলে দাবি করেছেন তা আসলে ধোপে টেকে না।

২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে বেছে নিয়ে মুজিবনগর সরকার আসলে জনগণের দেয়া ম্যান্ডেটের পরিবর্তে তাদের বিপ্লবের সাংবিধানিকতাকেই সম্মান দেখিয়েছে। সেই সময়কার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একথা বলা যায়, ২৬ ও ২৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন সেগুলোর মধ্য দিয়ে আসলে ইতোপূর্বে ছাত্র ও অন্যদের দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণাসমূহেকেই পুনরায় অনুমোদন দেয়া হয়। তাদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দুটি পূর্ব পাকিস্তানের পরিসমাপ্তি এবং বাংলাদেশ নামের জাতিরাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করে।

২৬ ও ২৭ মার্চের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দুটি সেদিন পরস্পর প্রতিযোগি স্বাধীনতার দুই ঘোষণা হিসেবে বিবেচিত হয়নি। বরং দুটি মিলে অভিন্ন একসত্তা লাভ করেছিল যাকে কাজে লাগিয়ে তখনকার সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃত্ব বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করে এবং তার অস্তিত্ব রক্ষার্থে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এ ব্যাখ্যা আরও বেশি শক্তিশালী হয় যখন দেখা যায় যে, জিয়াউর রহমান তার নিজের ঘোষণার মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর কর্তৃত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। দুটি বিবৃতিই যে পারস্পরিক ঐক্য সংহতি বজায় রেখেছে এই সত্য আরও বেশি প্রমাণিত হয় যখন দেখা যায় যে, উভয় ঘোষণাই জনসাধারণ্যে দেয়া ইতোপূর্বেকার ঘোষণাসমূহ থেকে নিজেদের অর্থ ও এবং শক্তি সঞ্চয় করেছে। বলা বাহুল্য, এসব ঘোষণা লক্ষপ্রাণের আত্মাহুতির মধ্যদিয়ে অগণন হয়ে উঠে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে।

পরিশেষে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, ইতিহাসবিদদের কাছে এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি নেই যা দিয়ে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন এবং নির্ণয় করতে পারেন এর স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতিদের অবদান। কিংবা নির্দেশ করতে পারেন এর সুফলভোগী কারা আর কারাইবা এর ভূক্তভোগী। রাজনৈতিক দলগুলো যে এদের প্রতিষ্ঠাতাদের উত্তরাধিকার আঁকড়ে থাকতে চায় তার পেছনে হয়তো তাদের দিক থেকে যথার্থতা রয়েছে। তবে স্বাধীনতার একটি পূর্ণাবয়ব ইতিহাস

www.pathagar.com

তুলে ধরতে হলে একজন মননশীল ব্যক্তিকে এই সংগ্রামের বহুমুখী জনসম্পৃক্তির দিকটিতে নজর দিতে হবে। সন্দেহ নেই যে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমানের মতো নন্দিত রাজনীতিকদের বক্তব্য ও ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে একথাও সত্য, স্বাধীনতার শুরুটা ঠিক তাদের দিয়েই হয়নি। বাংলাদেশ সর্বপ্রথম স্বাধীন হয় সাহসী ছাত্র-যুব নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী অগণন অনুজ্জ্বল অনুসারীর মতো তারাও ইতিহাসে তাদের ন্যায্য স্থান থেকে বঞ্চিত।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দিন আহমেদ

এ এইচ এম কামরুজ্জামান

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

খন্দকার মোস্তাক আহমেদ

www.pathagar.com

প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ

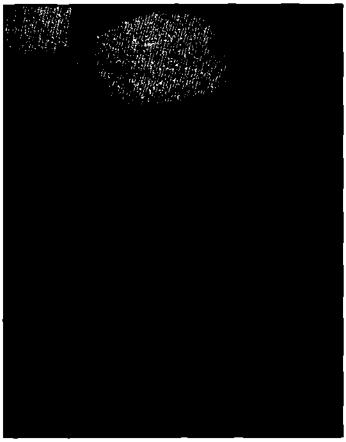

মওলানা ভাসানী

মনি সিং

মনোরঞ্জন ধর

প্রফেসর মুজাফ্‌ফর আহমেদ

www.pathagar.com

'নিউক্লিয়াস' এর তিন নেতা

সিরাজুল আলম খান

আবদুর রাজ্জাক

কাজী আরেফ আহমেদ

www.pathagar.com

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এর চার নেতা

নুরে আলম সিদ্দিকী

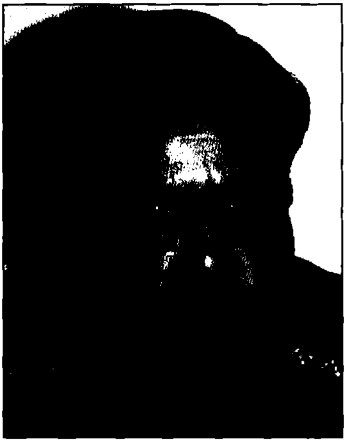

আ স ম আবদুর রব

আবদুল কুদ্দুস মাখন

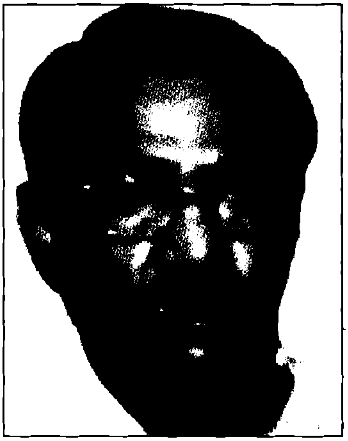

শাজাহান সিরাজ

www.pathagar.com

বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বি.এল.এফ-মুজিব বাহিনী) এর চার নেতা

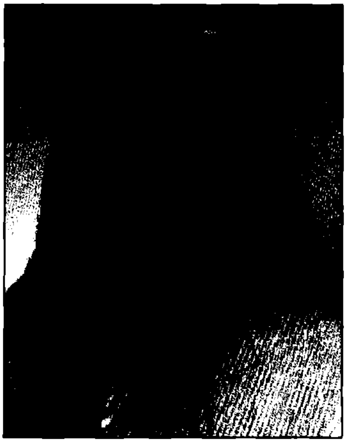

সিরাজুল আলম খান

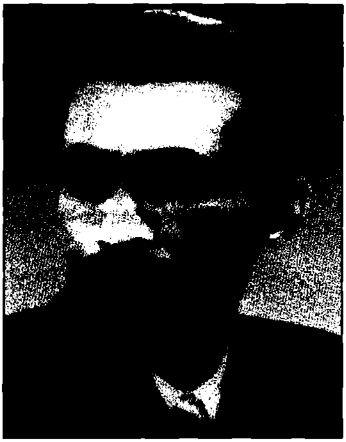

শেখ ফজলুল হক মণি

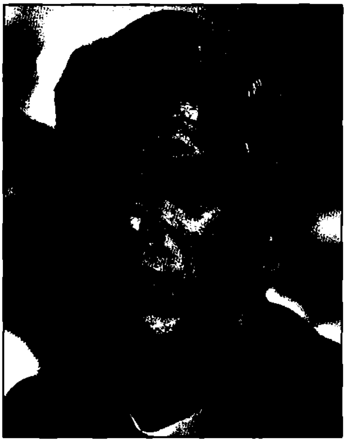

আবদুর রাজ্জাক

তোফায়েল আহমেদ

www.pathagar.com

স্বাধীনতার ইশতেহার : ৩ মার্চ, ১৯৭১

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে: গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালিকে গোলামে পরিণত করার জন্য বিদেশি পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালির মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে শেষ বারের মতো বিদেশি পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

১. স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক, শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

৩. স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে:

ক. বাঙলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে।

খ. সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

গ. শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে।

ঘ. হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

ঙ. স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে নিয়ে রাখার জন্যে পারস্পরিক যোগাযোগ করতে হবে। এবং লুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ:

অ. বর্তমান সরকারকে বিদেশি উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে বিদেশি সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনি বিবেচনা করতে হবে।

আ. তথাকথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পীবাহী পশ্চিমা অবাঙালি মিলিটারিকে বিদেশি ও

www.pathagar.com

হামলাকারী শত্রু সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এ হামলাকারী শত্রু সৈন্যকে খতম করতে হবে।

ই. বর্তমান বিদেশি উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

ঈ. স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণরত যে কোন শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খতম করার জন্যে সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

উ. বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

ঊ. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি........' সঙ্গীতটি ব্যবহৃত হবে।

ঋ. শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

এ. উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

ঐ. স্বাধীনতা সংগ্রামে রত বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ুন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক'।

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে।

স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'- দীর্ঘজীবী হউক।
স্বাধীন কর স্বাধীন কর– বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
স্বাধীন বাংলার মহান নেতা– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
গ্রামে গ্রামে দূর্গ গড়– মুক্তিবাহিনী গঠন কর।
বীর বাঙালি অস্ত্র ধর– বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
মুক্তি যদি পেতে চাও– বাঙালিরা এক হও।
বাংলা ও বাঙালির জয় হোক
জয় বাংলা।
স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদঃ ৩ মার্চ, ১৯৭১

[তথ্য সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্রঃ দ্বিতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, নভেম্বর ১৯৮২।

স্বাধীনতার ইশতেহার প্রণয়ন করে 'নিউক্লিয়াস'।........ প্রকাশক।]

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে এবং হচ্ছে। এর অধিকাংশই যতটা না বস্তুনিষ্ঠ তার চেয়ে বেশি আবেগ আক্রান্ত ও পক্ষপাতদুষ্ট। সঠিক ইতিহাস আশ্রয়ী এবং ইতিহাসের পাত্রপাত্রীদের সঠিক ভূমিকা ও মূল্যায়নভিত্তিক লেখা খুবই কম। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডেভিড লাডেন যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টিকে অনিবার্য করে তুলেছিল সেসবের একটি ইতিহাসসম্মত বিশ্লেষণ নির্মোহ দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। সেইসব নিয়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের ছবিসহ 'বিস্মৃত বীরেরা' নামের এই পুস্তিকাটি।

প্রকাশক